#আমি পদ্মজা পর্ব ২৩

_____

ফাতিমা করুণ চোখে লিখনের দিকে তাকান। চোখে চোখ পড়তেই লিখন হাসার চেষ্টা করল। তার দৃষ্টি এলোমেলো। কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আব্বা আসছি' বলে জায়গা ত্যাগ করে। শব্দর আলী মজিদ মাতব্বরকে প্রশ্ন করলেন,'মজা করছেন?'

মজিদ মাতব্বর শব্দর আলীর চোখের দিকে সরাসরি চোখ রেখে জবাব দিলেন,'প্রথম পরিচয়ে মজা করার মতো মানুষ আমি নই ভাইসাহেব।'

লিলি এক হাত লিখনের পিঠের উপর রাখল।ডাকল,'ভাইয়া।'

লিখন লিলির হাতটা মুঠোয় নিয়ে ঢোক গিলল। বলল,’বিয়ে হবে না তো কী? বলেছি যখন দেখাবোই।’

‘ভাইয়া তোর চোখে জল।’

লিখন দ্রুত হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পরিবেশ থম মেরে গেছে। কেউ কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না। লিলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার ভাইয়ার দিকে। পদ্মজা নামের মেয়েটাকে নিয়ে কত গল্প শুনেছে সে। মেয়েটা তার বয়সী শুনে লিলি খুব হেসেছিল। তার ভাইয়া এতো ছোট মেয়ের প্রেমে পড়েছে! দিনগুলো কত যে সুন্দর ছিল! মেট্রিক পরীক্ষার সময় বার বার খোঁজ নিয়েছে কবে শেষ হবে পরীক্ষা। যেদিন শেষ হলো সেদিন থেকেই শুটিং শুরু হলো। কথা ছিল এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হবে। কিছু জরুরি কারণে আগে শুরু হয়ে গেল। তাই আসতে

কয়েকদিন দেরি হলো। মজিদ মাতব্বর স্তব্ধতা কাটিয়ে বললেন,'বিয়েটা একটা দূর্ঘটনার জন্য খুব দ্রুত ঠিক হয়েছে।'

লিখন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'কী দূর্ঘটনা?'
ফরিনা সন্দিহান গলায় বললেন,'তার আগে তুমি কও তো, পদ্মজার লগে কী তোমার প্রেম-ট্রেম আছিল?'
লিখন ফরিনার প্রশ্নে বিব্রতবোধ করল। ধীরকণ্ঠে জবাব দিল,'না। শুধু আমার পক্ষ থেকেই।'

লিখনের উত্তরে ফরিনা সন্তুষ্ট হলেন। শব্দর আলী কী দূর্ঘটনা ঘটেছিল জানতে চাইলেন। মজিদ মাতব্বর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সব বলেন। সব শুনে লিখন আশার আলো দেখতে পায়। ভাবে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তাই অন্য কেউ পদ্মজাকে বিয়ে করবে না। এমনটা

ভেবেই হয়তো পদ্মজার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যদি এখুনি বিয়ে করতে রাজি থাকে। তাকে ফিরিয়ে না দিতেও পারে। আর পদ্মজা কী বিন্দুমাত্র ভালোবাসে না তাকে? বাসে, নিশ্চয় বাসে। লিখন নিজেকে নিজে স্বান্তনা দেয়। শব্দর আলী আফসোস নিয়ে বললেন,'কী আর করার! পরিস্থিতি হাতের বাইরে।'

'আপনারা কিন্তু বিয়ে শেষ করে তবেই যাবেন।' বললেন মজিদ মাতব্বর।
ফাতিমা মতামত জানালেন দৃঢ়ভাবে,'না, না আজই চলে যাব। এই গ্রামে আর এক মুহূর্ত না।'
শব্দর আলী মৃদু করে ধমকে বললেন,'কী বলছো? কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা। এখন ট্রেন পাবে কোথায়? কাল ভোরে নাহয় চলে যাব।'
রিদওয়ান অনুরোধ করে বলল,'বিয়েটা শেষ হওয়া অবধি থেকে যান। দেখুন, মেহমান হয়ে

এসেই অপ্রত্যাশিত খবর শুনলেন। এজন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু তো করার নেই। মেয়েটা জলে ভাসবে বিয়েটা না হলে।’
লিখন সঙ্গে,সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল,’পদ্মজাকে ফেলনা ভাবছেন কেন? কেউ অপবাদ দিলেই কী সে পঁচে যায়?’

রিদওয়ান কিছু বলতে গেলে মজিদ মাতব্বর কড়া চোখে তাকিয়ে থামতে বললেন। এরপর শিখাকে ডেকে বলেন,’উনাদের ঘরে নিয়ে যাও। আর আপনারা না করবেন না। আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। বিয়ে অবধি না থাকুন। রাতটা থেকে যান।’

বাধ্য হয়ে ফাতিমা থাকতে রাজি হলেন। তিনি রাগে ফোঁসফোঁস করছেন। সব রাগ পড়েছে হাওলাদার বাড়ির উপর। মনে মনে এই বাড়ির বিনাশ চাইছেন তিনি। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। লিখন তার চোখের মণি।

নয়তো কী গ্রামের মেয়ে নিতে আসতেন! আর সেই ছেলের মন এভাবে ভাঙল! ঘরে ঢুকেই চোখের চশমা ছুঁড়ে ফেলেন বিছানায়। কটমট করে শব্দর আলীকে বললেন,'তোমার না এক বন্ধু আছে মেজর। তাকে কল করে বলো মেয়েটাকে তুলে এনে লিখনের সাথে বিয়ে দিতে। আমার ছেলেকে হারতে দেখতে পারব না।'

'আহ! চুপ করো তো। সব জায়গায় ক্ষমতা চলে না। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো।'

'কিসের পরিস্থিতি? তুমি জানো, তোমার ছেলের ব্যাক্তিগত ডায়রিতে আগে শুধু আমার নাম ছিল। সেখানে এখন বেশিরভাগ পদ্মজা নামটা লিখা। কতটা পাগল এই মেয়ের জন্য। এখন মেয়েটাকে ছেড়ে শহরে চলে গেলে,ছেলের দেবদাস রূপ দেখতে হবে। আর আমি তা পারব না।'

শব্দর আলী পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বিরক্তি নিয়ে বললেন,’তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি পারব না। ক্লান্ত আমি। শান্তি দাও।’

ফাতিমা কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। লিলি ঘরে ঢুকেছে। লিখন আসেনি। আমেনা লিলিকে বললেন,’লিখন কোথায়?’

‘কী জানি! ভাইয়া ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।’

রোদের কঠিন রূপ শীতল হয়ে এসেছে। মৃদু বাতাস বইছে। তবুও লিখন ঘামছে। সে পদ্মজাদের বাড়ি যাচ্ছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মাথায় শুধু কয়টা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে,’আমি কী পাগলামি করছি? এতো আয়োজন ভেঙ্গে কী আমার হাতে তুলে দিবেন পদ্মজাকে? পদ্মজা আমাকে দেখলে কী কাঁদবে? ভালোবাসেনি একটুও? মায়া নিশ্চয় জমেছে?’ লিখন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে

মনে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে,'আল্লাহ, সব যেন ভালো হয়।'

_____

পূর্ণা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে। বাড়ির পিছনে গীত গাইছে অনেকে। সাথে তাল মিলিয়ে দুই বুড়ি নাচ করছে। পুরো বাড়ি সাজানো হচ্ছে রঙিন কাগজ দিয়ে। উঠানের এক কোণে লাল বড় গরু বাঁধা। বিয়ে উপলক্ষে জবাই করা হবে। চারিদিকের এতো আনন্দ পূর্ণার মন ছুঁতে পারছে না। প্রথমত, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত! কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, পদ্মজার জন্য লিখন শাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার পছন্দ হচ্ছে না। সব মিলিয়ে সে বিরক্ত। চোখ ছোট করে বাচ্চাদের খেলা দেখছে। হুট করে চোখে ভাসে লিখনকে। পূর্ণা দ্রুত চোখ কচলে আবার তাকাল। সত্যি তাই। খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে যায় পদ্মজার ঘরে। পদ্মজার কানে কান গিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে। তুমি কিন্তু পালিয়ে যাবে আপা। এই বিয়ে কিছুতেই করবে না।'

কথা শেষ করে খুশিতে আবার ছুটে যায় বারান্দায়। এমন দিনে লিখনের উপস্থিতি পদ্মজাকে অপ্রস্তুত করে তুলে। গলা শুকিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। লিখন বাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে সব দেখে। কত আয়োজন! কত মানুষ! তার স্বপ্নের রানি পদ্মজার বিয়ে। কিন্তু তার সাথে না। ভাবতেই, লিখনের বুক ছ্যাঁত করে উঠল। মেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে সুদর্শন লিখনকে দেখছে। লিখন পূর্ণাকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল,'কেমন আছো পূর্ণা?'

পূর্ণা খুশিতে উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়,'ভালো,খুব ভালো। ভাইয়া আপনি...'

পূর্ণা থেমে গেল। অনেকে তার উচ্চ গলার স্বর শুনে তাকিয়ে আছে। তাই পূর্ণা চুপসে গেল। আস্তে আস্তে বলল,'এতো দেরিতে আসলেন কেন? আপার তো বিয়ে। আপনি আপাকে নিয়ে পালিয়ে যান।'
পূর্ণার এহেন কথায় লিখন হাসে। আদুরে কণ্ঠে জানতে চাইল,'আন্টি কোথায়?'
পূর্ণা ঝটপট করে বলল,'আপনি আসুন ঘরে। আমি আম্মাকে নিয়ে আসছি।'

লিখনকে সদর ঘরে বসিয়ে পূর্ণা ছুটে গেল রান্নাঘরে। হেমলতা রান্না করছিলেন। পাশে অনেকে আছে। পূর্ণা ইশারায় বাইরে আসতে বলে। হেমলতা হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে।'
'কোথায়? বসতে দিয়েছিস?'
'হ্যাঁ, দিছি। তুমি আসো।'

হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে সদর ঘরে আসেন। এসে দেখেন দুজন বয়স্ক মহিলা অনবরত লিখনকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে কই থেকে এসেছে? এই বাড়ির কী হয়? পদ্মজার মতো চোখ কেন? পদ্মজার আসল বাপের ছেলে নাকি। এমন আরো যুক্তিহীন কথাবার্তা। হেমলতা সবাইকে উপেক্ষা করে লিখনকে বললেন,'লিখন তুমি আমার সাথে আমার ঘরে আসো।'

লিখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হেমলতার পিছু পিছু চলে যায়। অনেকের নজরে তা আসে। একজন আরেকজনকের সাথে আলোচনা করতে থাকে লিখন শাহকে নিয়ে। সবাই ভেবে নিয়েছে পদ্মজা যার সন্তান এই ছেলেও তার সন্তান। এজন্যই সবার মাঝ থেকে তুলে নিয়েছে। নয়তো তো কথায় কথায় ধরা পড়ে যাবে। লিখনকে মোড়ায় বসতে দিলেন

হেমলতা। লিখন কীভাবে কী শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হেমলতা শুরু করলেন,'আমি জানি তুমি কী বলবে। তোমার দুইটা চিঠি আমি পড়েছি।'

লিখন চমকে তাকাল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেমলতা বলেন,'দেখো লিখন,পরিস্থিতি আর হাতে নেই। অন্য সময় হলে আমি পদ্মজাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। তুমি নম্র-ভদ্র বুদ্ধিমান ছেলে। কমতি নেই কিছুতেই। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তবুও পদ্মজা তোমাকে নিজের মুখে যদি চায় আমি তাৎক্ষণিক তাকে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু সে চাইবে না। কারণ,সে তোমাকে ভালোবাসে না। আমার কথাগুলো শুনে কষ্ট পেয়ো না। আমি সরাসরি কথা বলি। পদ্মজার দৃষ্টি,অনুভূতি আমার চেনা। সে তোমাকে ভালোবাসেনি কখনো। তোমার মন ভাঙবে

ভেবে মায়া হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কষ্ট হবে ভেবেই বলছি ফিরে যাও।’

লিখন কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকে। চোখের দৃষ্টি রাখা মাটিতে। বলল,’আন্টি মেয়ের ভালোবাসা দেখছেন, অন্যের সন্তানেরটা দেখবেন না?’
‘অন্যের অনেক সন্তানই আমার মেয়েকে ভালবাসে। সবার কথা ভাবা কী সম্ভব?’

হেমলতার কথায় ভীষণ আহত হয় লিখন। তার মনে হচ্ছে সে কঠিন পাথরের সাথে কথা বলছে। দুই চোখ জ্বলছে ভীষণ। এখুনি কান্নারা ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসবে। ছেলে হয়ে কাঁদা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। লিখন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। হেমলতা কঠিন স্বরে বললেন,’তুমি পদ্মজার রূপের প্রেমে পড়েছো লিখন।’

লিখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকায়।
বলে,’আন্টি ক্ষমা করবেন কিছু কথা বলি।

পৃথিবীতে যে কয়টা সফল প্রেমের গল্প আছে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ সৌন্দর্যের টান দিয়ে শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ভালোবাসা গভীর হয়। মানুষটাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে,মানুষটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে ভালোবাসাটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সময়ের ব্যবধানে সে মানুষটা শিরা উপশিরায় বিরাজ শুরু করে। তখন তার অন্যান্য গুণ চোখে ভাসে। ভালবাসা আরো বাড়ে। কারো কারো তো দোষও ভালো লেগে যায়। তখন অবস্থা এরকম হয় যে, রূপ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষটাকে আমার চাই। এজন্যই বুড়ো বয়সেও কুঁচকে যাওয়া মানুষটাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অথচ শুরুটা হয় সৌন্দর্য দিয়ে। আন্টি,আমি পদ্মজার রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম এটা সত্যি। কিন্তু গত কয়েক মাসে সারাক্ষণ পদ্মজাকে ভাবতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি পদ্মজাকে ভালোবেসে ফেলেছি। পদ্মজার রূপ আগুনে ঝলসে গেলেও এমন

করেই বাসবো। প্লীজ আন্টি কথাগুলো শুটিংয়ের ডায়লগ ভেবে উড়িয়ে দিবেন না। বাস্তব জীবনে মুখস্থ ডায়লগ আমি আওড়াই না।’

লিখনের কণ্ঠ গম্ভীর কিন্তু চোখে জল ছলছল করছে। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে যান। কী জবাব দিবেন? ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোন শক্তি কাজে লাগে? আদৌ কী ভালবাসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তিনি সময় নেন। এরপর বলেন,’আমার পদ্মজা তোমার কাছে খুব ভাল থাকতো লিখন। কিন্তু কিছু সমস্যা সমাজে আছে। যার মুখোমুখি আমি হয়েছি। জেনেশুনে আমার মেয়েকে সেসবের মুখোমুখি কি করে হতে দেই?’

লিখন হাতজোড় করে বলল,’প্লীজ আন্টি!’

হেমলতা একদৃষ্টে লিখনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এমন

তো কখনো হয় না। পদ্মজার জন্মের পর সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি কখনো ভুগেননি। যেকোনো একটাই বেছে নিয়েছেন। আর তাতেই মঙ্গল হয়েছে। এবার কেন এমন হচ্ছে? কেন তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। পদ্মজার জীবন নিয়ে তিনি যেন মাঝ নদীতে ভেসে আছেন। চারদিকে স্রোত। মাঝি নেই,বৈঠা নেই। আমির না লিখন? কার কাছে ভাল থাকবে পদ্মজা? হেমলতার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। তিনি দূর্বল কণ্ঠে বলেন,'এতো বুঝো যখন নিজেকেও সামলাতে পারবে। বাড়ি ফিরে যাও।'
'আন্টি,আমার বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে।'
'পদ্মজার সাথে যা হয়েছে তবুও সে বেঁচে আছে। আর তুমি এইটুকু মানিয়ে নিতে পারবে না?'

লিখন আর কথা খুঁজে পেল না। আহত মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেমলতা দাঁড়াতে বললেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তবুও হেঁটে এগিয়ে আসেন। লিখনের সামনে এসে দাঁড়ান। বললেন,'নিজেকে শক্ত রেখো। অনেক দূর চলা বাকি। কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। সব যেহেতু আয়োজন হয়ে গেছে আর ভেবে লাভ নেই। তবে, কবুল বলার আগেও যদি পদ্মজা বলে, তার তোমাকেই চাই। আমি সব ভেঙেচুরে পদ্মজাকে নিয়ে ছুটে যাব তোমার বাড়ি। আমি আমার মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবাসি বাবা। এই মেয়েটার সুখের জন্য আমি স্বার্থপর হয়েছি। অন্যের সন্তানের কষ্ট চোখে ভেসেও, ভাসছে না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

হেমলতার চোখে জলের ভীর। লিখন ভীষণ অবাক হয়ে দেখে এই কঠিন মানুষটাকে।

হেমলতা নিজের দূর্বলতা, নিজের কান্না কেন দেখাল লিখনকে? লিখন জবাব খুঁজে পেল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল হেমলতার কাছে জীবন মানে পদ্মজা। লিখন ভাঙা গলায় 'আসি' বলে চলে গেল। হেমলতা সব কাজ ভুলে গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। মনের শক্তি কমে গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের উপর বিশ্বাস, আস্থা পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছেন না।

চলবে...